Vol. 49 | No. 3 | 2012

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সামষ্টিক ভাষাবোধের ব্যাকরণ ও রবীন্দ্রনাথের বাংলা ব্যাকরণের রূপকল্প

Volume	49
Issue	3
Year	2012
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Hakim Arif
Published online	June 1, 2012
DOI	10.62328/sp.v49i3(2).7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v49i3(2).7
Pages	১২৫-১৩৯
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৪৯, সংখ্যা : ৩ ॥ আষাঢ় ১৪১৯ ॥ জুন ২০১২

সামষ্টিক ভাষাবোধের ব্যাকরণ ও রবীন্দ্রনাথের বাংলা ব্যাকরণের রূপব

Check for updates

হাকিম আরিফ*

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাষা ও ব্যাকরণগত উপাদান বিশ্লেষণে বস্তুনিষ্ঠ ও প্রয়োগবাদী ছিলেন। এই বস্তুনিষ্ঠা ও বিজ্ঞানমনস্কতার ছায়াপাত ঘটেছে তাঁর *শব্দতত্ত্ব* (১৯০৯) গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধের অবয়বে যেখানে তিনি বাংলা ভাষার বিবিধ ব্যাকরণিক উপাদানের গাঠনিক বর্ণনা দিয়েছেন। আটপৌরে বাঙালি জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ভাষিক উপাদানসমূহ (সংস্কৃত ও বিদেশী শব্দাবলিসহ) কিভাবে দীর্ঘদিনের পরিচর্যার দ্বারা বাংলা ভাষার ছাঁচ কাঠামোর কল্যাণে বাংলা হয়ে উঠেছে তারই একটি রূপরেখা তিনি এ গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন। অর্থাৎ বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত একটি নিজস্ব কাঠমো আছে যার দ্বারা প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণ রচনা সম্ভব—এই সত্যটির দিকেই তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন।

বাংলা ব্যাকরণের অন্তর্নিহিত ছাঁচ থাকা সত্ত্বেও তৎকালীন সংস্কৃত পণ্ডিতদের করতলগত হয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ কাঠামো কিভাবে বাংলার ঘাড়ে সওয়ার হয়েছে সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন লেখায় বিস্তর খেদ প্রকাশ করেছেন। তবে প্রকৃতপক্ষে ভাষা ও ব্যাকরণ সংক্রান্ত তাঁর যে কোনো রচনাতেই এই খেদোক্তির আড়ালেই উঁকি দিয়ে উঠেছে প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণ রচনা সম্পর্কে প্রবল আশাবাদ। রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের খেদোক্তি, আশাবাদ ও তাঁর বিশ্লেষিত বাংলা ব্যাকরণ কাঠামো সম্পর্কে পরবর্তীকালে বিস্তর লেখালেখি ও পর্যালোচনা হলেও এ ধরনের ব্যাকরণ রচনার একটি প্রায়োগিক পদ্ধতি কী হতে পারে, সে বিষয়ে সমালোচকদের বর্ণনা একেবারেই অনুপস্থিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর উপরিউক্ত গ্রন্থসহ ভাষাবিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধে এ সম্পর্কে কিছু সংকেত প্রদান করেছেন, যার মধ্য থেকে প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণ, বিশেষ করে এর অনুসৃতব্য পদ্ধতি সম্পর্কে একটি রূপকল্প উপস্থিত করা সম্ভব। এ বর্ণনামূলক প্রবন্ধে, রবীন্দ্র-বর্ণনার আলোকে, তাঁর প্রস্তাবিত বাংলা ব্যাকরণ নির্মাণ বিষয়ে একটি প্রায়োগিক পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। পাশাপাশি, বাংলা ভাষার ভাবনা-কাঠামো বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে সংস্কৃত ব্যাকরণ-কাঠামোর প্রভাব সম্পর্কে রবীন্দ্র-বিশ্লেষণের এক ধরনের পুনর্মূল্যায়নও এতে উপস্থাপিত হয়েছে।

১. সংস্কৃত ব্যাকরণ কাঠামোর ছায়ায় বাংলা ব্যাকরণ

ভাষাবিজ্ঞান শাস্ত্রের বিবর্তনের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সময়ে ভাষা ও ব্যাকরণ চর্চায় ব্যাপৃত ছিলেন সেটি ছিল তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের যুগ (সুনীল ১৯৮৯)। ১৭৮৬ সালে উইলিয়াম জোনসের দ্বারা ভাষাবিজ্ঞানের

*সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এই তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক যুগপর্বটি শুরু (আজাদ ১৯৯৮) হওয়ার পিছনে এক দিকে ভারত ও অন্যদিকে ইউরোপের প্রাচীন ভাষা যথাক্রমে সংস্কৃত ও গ্রীক-লাতিনের ঐতিহাসিক সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টি জড়িত ছিল। এছাড়া এ ধারার বিশ্লেষণ ও গবেষণাপর্বটি অতিমাত্রায় বিদ্যায়তনিক হওয়ার কারণে মূলত বিভিন্ন ভাষার ঐতিহাসিক বিবর্তন ও তুলনামূলক গবেষণায় পারদর্শী ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতরাই কেবল এ ধরনের গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন। ফলে যৌক্তিক কারণেই যে কোনো ভাষার ব্যাকরণিক উপাদান বিশ্লেণের ক্ষেত্রে তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ধারার পাশাপাশি প্রথাগত ব্যাকরণের ধারাটিও অক্ষুণ্ন ছিল এবং এর এক ধরনের সর্বব্যাপী আবেদনও ছিল। মূলত ভাষাবিজ্ঞান শাস্ত্রের যুগ বিভাজন অনুসারে প্রাচীন কাল থেকে প্রবহমান এ প্রথাগত ধারাটি কোনো অনুন্নত বা ভার্নাকুলার ভাষার ব্যাকরণ বিশ্লেষণে ওই অঞ্চলের সমৃদ্ধ ভাষাটির সাহায্য গ্রহণ করত। অর্থাৎ সমৃদ্ধ ভাষাটির ব্যাকরণ কাঠামোর আলোকে ভার্নাকুলার ভাষার ব্যাকরণিক উপাদান বিশ্লেষণপূর্বক ওই কাঠামোর মান্যতা অনুসারে ভার্নাকুলার ভাষাটির বিভিন্ন উপাদানের শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা নির্ণয় করত। প্রথাগত পদ্ধতিতে এই প্রক্রিয়ায় ভাষা বিশ্লেষণ তখন শুধু ভারতবর্ষেই নয়, বৃহত্তর ইউরোপীয় অঞ্চলেও স্বীকৃত প্রথারূপে বিবেচিত হতো। কেননা, ইংরেজি, জর্মন ইত্যাদি ভাষার ব্যাকরণকে লাতিন ভাষার ব্যাকরণের ছাঁচে ঢালাই করে নেওয়ার প্রবণতা তখন ইউরোপে বর্তমান ছিল (আবদুল হাই ১৯৯৪)।

ভারতবর্ষের প্রদেশিক বা একটি উল্লেখযোগ্য ভার্নাকুলার ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার বিভিন্ন ব্যাকরণিক উপাদানের বিশ্লেষণও প্রথাগত ব্যাকরণের অনুসৃত পথ ধরেই শুরু হয়েছিল। এক্ষেত্রে তৎকালীন ব্যাকরণবিদরা সর্ব-ভারতের অতি সমৃদ্ধ লেখ্য ভাষা সংস্কৃতের ব্যাকরণ কাঠামোকেই এ ভাষার ব্যাকরণিক উপাদান বিশ্লেষণে আদর্শ হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। এ ধরনের সংস্কৃত কাঠামো নির্ভর বাংলা ব্যাকরণ নির্মাণের জন্য শুধু যে তৎকালীন সংস্কৃত জানা বাঙালি পণ্ডিতরা বিচ্ছিন্নভাবে দায়ী তা-ই নয়, বরং অ্যাকাডেমিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজও উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেছিল। এ প্রসঙ্গে আবদুল হাই বলেন —

> [...], বাংলা গদ্য প্রথমত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সংস্কৃত পণ্ডিতদের হাতে গ'ড়ে ওঠার জন্যে এবং সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার সগোত্রতার জন্যে তেমনি বাঙালী পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষার ব্যাকরণ লিখতে গিয়ে সংস্কৃত ভাষার সূত্রাদির ভিত্তিতে তার প্রকৃতি বিচার করতেন। (১৯৯৪: ৪৩৮)

এ প্রসঙ্গে উপরিউক্ত উদ্ধৃতির লেখক আমাদের আরও জানাচ্ছেন যে, বাংলা ভাষার যে সমস্ত নিজস্ব ব্যাকরণিক উপাদান, যথা—দেশজ, দ্বিত্ববোধক ও ধন্যাত্মক শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণের ছাঁচে ফেলে ব্যাখ্যা করা যেত না, সেসব উপাদানকে বাংলা ব্যাকরণে শুধু অপাংক্তেয়ই মনে করা হতো না, লিখিত বাংলায় এদের ব্যবহারকেও দূষণীয় জ্ঞান করা হতো। মোটের উপর, তখনকার বিদ্বৎসমাজে ভাষার এ ধরনের আরোহী বিশ্লেষণে ব্যাকরণ নির্মাণ খুবই স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত ধারা বলে বিবেচিত ছিল।

২. (সংস্কৃতনির্ভর) প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণের সীমাবদ্ধতা

প্রথাগত ব্যাকরণবিদদের সংস্কৃত ব্যাকরণের ছাঁচে ফেলে বাংলার ভাষিক উপাদানকে বিচার করার প্রক্রিয়াটি পরিণামে ভালো ফল দেয়নি। মূলত প্রাণবান বাংলা ভাষার পায়ে মৃত সংস্কৃত ব্যাকরণের জুতা পরানোর কারণে সর্বদা বিকাশমান বাংলা ভাষার বহু ব্যাকরণিক উপাদানকে সে যথাযথ ব্যাখ্যা করতে পারেনি। পরিণতিতে সংস্কৃত অভিমুখী প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণ এক সীমাবদ্ধ ব্যাকরণে পরিণত হয়। এ ধরনের বাংলা ব্যাকরণের আরেকটি উল্লেখ করার মতো সীমাবদ্ধতা হলো, এটি পরিপূর্ণভাবে সংস্কৃত, যেটি ছিল মূলত লিখিত ভাষার ব্যাকরণ, প্রভাবিত হওয়ার কারণে তৎকালীন বাংলা বৈয়াকরণরা বাঙালির মৌখিক রূপকে উপেক্ষা করে লিখিত বাংলার ব্যাকরণ নির্মাণ করেছিলেন। শ্যামাচরণ (১৮৭৭) প্রথম এই বিষয়টি সবার নজরে নিয়ে আসেন। পবিত্র সরকার (১৯৯০) আমাদের জানাচ্ছেন যে, তৎকালীন সংস্কৃত পণ্ডিতদের সংস্কৃত শব্দানুসারী আড়ম্বরপূর্ণ বাংলা গদ্য শ্যামাচরণকে পীড়িত করত বলে তারই প্রতিক্রিয়ায় শ্যামাচরণ তাঁর বিখ্যাত Bengali, Spoken and Written (১৮৭৭) প্রবন্ধটি *The Calcutta Review*তে প্রকাশ করেন যেখানে তিনি প্রথম সাহিত্যের ভাষারূপে চলিত ভাষারীতিকে প্রস্তাব করার পাশপাশি সে সময়কার সংস্কৃতনির্ভর বাংলা ব্যাকরণের সমালোচনায় তৎপর হন। এ ধরনের বাংলা ব্যাকরণগুলি যে মৌখিক ও লিখিত ক্রিয়াপদের পার্থক্য নির্দেশ করতে অসমর্থ তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন —

> In the spoken tongue, the infinitive and the perfect participle have the same form; for instancs, *kará* = 'to do', 'doing'; and *kará* also = 'done'. Bengali grammar books would scarcely recognize the form *kará* at all. (1990 [1877]: 17)

শ্যামাচরণের (১৮৭৭) মতে, প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণের আরেকটি বড় ত্রুটি হচ্ছে, এতে বহু সংস্কৃত ব্যাকরণিক রূপের অপ্রয়োজনীয় অনুপ্রবেশ। তিনি বলেন, বাংলা ব্যাকরণের কারক অধ্যায়টি একেবারেই সংস্কৃতের অনুরূপ। তাঁর বিবেচনায় বাংলায় যেহেতু করণ, সম্বোধন ও অপাদান কারক নেই, তাই বাংলা ব্যাকরণে এদের অন্তর্ভুক্তি অযৌক্তিক। এছাড়া সংস্কৃত সন্ধির অধ্যায়ও তাঁর মতে পরিহারযোগ্য (নির্মল ২০০০)। বাংলা ব্যাকরণে সন্ধির অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে ইন্দ্রনাথ (১৮৯৫-৯৬) শ্যামাচরণের মতকে সমর্থন করে বলেন, 'সন্ধি সম্বন্ধে সংস্কৃতের নিয়ম বাঙ্গালা ভাষায় খাটাইতে গেলে কতকটা গায়ের জোর প্রকাশ করা হয় না কি?' (উদ্ধৃত নির্মল ২০০০: ২৪৪)। এরই ধারাবাহিকতায় অনাবশ্যকভাবে সংস্কৃত থেকে এ ধরনের শব্দ ও ব্যাকরণরূপ অন্তর্ভুক্তির কারণে প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণকে কেউ কেউ আবার 'ভেজাল ব্যাকরণ'ও আখ্যা দিয়েছেন। গোপাল হালদার বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেন এভাবে —

> আমাদের এই বাঙালী বৈয়াকরণেরা সেই সংস্কৃত ব্যাকরণের আধারে বাঙলা ব্যাকরণ ঢেলে দেন, বাঙলা ভাষার পৃথকত্ব, বৈশিষ্ট্য প্রভৃতিকে লক্ষও করেন না; সে সম্বন্ধে ভাবেনই না। বিশেষ ক'রে স্কুল-কলেজে এই গতানুগতিক ধারার বাঙলা ব্যাকরণ চলিত থাকায় অনেকেই দমে যান। আসলে এসব ব্যাকরণ বাঙলা ভাষার ব্যাকরণই নয়---সংস্কৃত ব্যাকরণের সেই শব্দরূপ, ধাতুরূপ, সন্ধি-সমাস, বিভক্তি প্রত্যয়াদি---একে বলে 'ভেজাল ব্যাকরণ'। (১৯৮৯: x)

প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণের অতি মাত্রায় সংস্কৃতনির্ভরতা সংক্রান্ত সমালোচনা-ফর্দ দীর্ঘায়িত না করে বরং উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এ ব্যাকরণের কতিপয় প্রধান সীমাবদ্ধতা এখানে লিপিবদ্ধ করতে পারি। —

ক. প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণ অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় সংস্কৃত ব্যাকরণিক উপাদানের অন্তর্ভুক্তি দোষে দুষ্ট।
খ. সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্রাদির মানদণ্ডে বাংলা ভাষার উপাদানসমূহ এতে ব্যাখ্যাত।
গ. সংস্কৃত নিয়মের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিধায় বাংলা ভাষার অনেক নিজস্ব ব্যাকরণিক উপাদান, যথা—দেশজ, দ্বিত্ববোধক ও ধন্যাত্মক শব্দের আলোচনা এতে অনালোচিত।
ঘ. এ ব্যাকরণ মূলত লিখিত ভাষানির্ভর, ফলে মৌখিক রূপটি এতে উপেক্ষিত।

৩. রবীন্দ্র বিশ্লেষণে প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সমকালে অথবা পূর্ববর্তী সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণের নানামাত্রিক সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন; যার প্রমাণ তাঁরই রচিত ভাষা ও ব্যাকরণ বিষয়ক নানা প্রবন্ধে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এসব রচনায় তিনি প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণে অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি—উভয়ের আলোচনার পাশাপাশি ব্যাপক ও অনুসন্ধানী দৃষ্টি সহযোগে এদের অভ্যন্তরস্থ ত্রুটি নির্দেশে তৎপর হয়েছেন। এছাড়া বিদ্যালয় পর্যায়ে বাংলা ব্যাকরণের নামে এসব সংস্কৃত ব্যাকরণ পঠনেরও কঠোর সমালোচনা করেছেন। পরিশেষে, তিনি প্রচল সংস্কৃতনির্ভর প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণ কাঠামোর বিপরীতে বাংলা ভাষার একটি নিজস্ব প্রাণ-কাঠামো উন্মোচনে যুক্তি দেখিয়েছেন।

অন্য সমালোচকদের মতোই রবীন্দ্রনাথ অধিকাংশ প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণে সংস্কৃত বিভিন্ন ব্যাকরণিক পরিভাষার অনাবশ্যক ছায়াপাত লক্ষ করেছেন। বাংলা ব্যাকরণে বাংলাভাষী সংস্কৃত পণ্ডিতদের দ্বারা এসব ব্যাকরণিক পরিভাষা আরোপণের মধ্যে তিনি কোনো যৌক্তিকতা বা সারবত্তা খুঁজে পাননি। উদাহরণস্বরূপ, 'বাংলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধে বাংলা ব্যাকরণের কারক অধ্যায়ে সংস্কৃত সম্প্রদান কারকের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। সংস্কৃত ভাষায় অর্থ ও বিভক্তি প্রয়োগের দিক থেকে কর্ম ও সম্প্রদান কারকের পৃথক অস্তিত্ব থাকলেও (আবদুল হাই ১৯৯৪), তাঁর মতে বাংলায় সম্প্রদান কারক কর্মকারকের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। ফলে বাংলা ব্যাকরণে এর অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন নেই। কিন্তু তারপরেও যেহেতু সংস্কৃত পণ্ডিতবর্গ এর অন্তর্ভুক্তি রেখেছেন, রবীন্দ্রনাথ হাস্যরস সহযোগে এই কারকের অন্তর্ভুক্তি সাপেক্ষে আরও কিছু নতুন কারকের প্রস্তাব করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর উদ্ধৃতি প্রণিধানযোগ্য—

> সংস্কৃত ভাষায় সম্প্রদানকারক বলিয়া একটা স্বতন্ত্র কারক আছে, বিভক্তিতেই তার প্রমাণ। বাংলায় সে কারক নাই, কর্মকারকের মধ্যে সম্পূর্ণ লুপ্ত। তবু সংস্কৃত ব্যাকরণের নজিরে যদি বাংলা ব্যাকরণে সম্প্রদানকারক জবরদস্তি করিয়া চালাইতে হয়, তবে এ কথাই বা কেন না বলা যায় যে, বাংলায় দ্বিবচন আছে।...'তাহাকে দিলাম' যদি সম্প্রদান-কারকের কোঠায় পড়ে, তবে 'তাহাকে মারিলাম' সন্তাড়ন-কারক; 'ছেলেকে কোলে লইলাম' সংলালন-কারক ; 'সন্দেশ খাইলাম' সম্ভোজন-কারক ; 'মাথা নাড়িলাম' সঞ্চালন-কারক এবং বাংলা কর্ম-কারকের গর্ভ হইতে এমন সহস্র সঙের সৃষ্টি হইতে পারে। (বাংলা ব্যাকরণ, রবীন্দ্রনাথ ২০১১ : ৭৫১)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিতে রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন বাংলা ব্যাকরণের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে বিদ্যমান কিছু অসংগতির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কারণ এ উক্তি প্রণিধানযোগ্য যে, শুধু সংস্কৃত নির্ভরতার কারণে যদি অপ্রচল সম্প্রদান কারককে বাংলায় চালু করতেই হয়, তাহলে সংস্কৃতের দ্বিবচনসহ আরও বিভিন্ন ব্যাকরণিক পরিভাষা বাংলা ব্যাকরণে কেন যুক্ত হবে না। তবে একটু সচেতনভাবে লক্ষ করলেই বোঝা যাবে যে উপরিউক্ত উদ্ধৃতিতে উক্ত বাংলায় দ্বিবচন চালু সংক্রান্ত রবীন্দ্রনাথের এই ঔৎসুক্যটি যত না প্রশ্ন, তার চেয়ে অনেক বেশি খেদোক্তি। মূলত তিনি এই খেদোক্তি করেছেন তৎকালীন প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণবিদদের সংস্কৃত নির্ভরতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে। তাঁর এ ধরনের খেদোক্তি *শব্দতত্ত্ব* (১৯০৯) গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে বিস্তৃত পরিসরে লক্ষণীয়। সর্বোপরি, বাংলা ব্যাকরণের এসব অসংগতি বাঙালি সংস্কৃত পণ্ডিতদের সচেতন প্রয়াসের ফল বলেই ধরে নেওয়া যায়। কেননা, তাঁর বিবেচনায় এসব সংস্কৃত পরিভাষার অন্তর্ভুক্তি যত না বাংলার ভাষিক উপাদান বিশ্লেষণের জন্য করা হয়েছে, তার চেয়ে অধিক পরিমাণে সংস্কৃত বিষয়ে তৎকালীন বৈয়াকরণদের নিজস্ব পাণ্ডিত্য জাহিরের পাশাপাশি বাংলাকে সংস্কৃতের অধিকতর নিকটবর্তী হিসেবে প্রমাণের প্রচেষ্টা হিসেবে সাধিত হয়েছে।

তৎকালীন বাংলা ব্যাকরণগুলো উপরিউক্ত অসংগতি সম্পৃক্ত বিভিন্ন সংস্কৃত পরিভাষা, সূত্র ও নিয়ম বাহুল্যে যে আকৃতি ধারণ করে তা, রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নে, আর বাংলা ব্যাকরণ থাকে না ; বরং হয়ে ওঠে 'কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিবর্তিত সংস্কৃত ব্যাকরণ'। ফলে রবীন্দ্রনাথ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা এ ধরনের ব্যাকরণ পড়ে বাংলা বিষয়ে অল্পই উপকৃত হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে বিষয়টি বলা যেতে পারে এভাবে —

> আমরা যেমন বিদ্যালয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস নাম দিয়া মহম্মদঘোরী বাবর হুমায়ুনের ইতিহাস পড়ি, তাহাতে অতি অল্প পরিমাণ ভারতবর্ষ মিশ্রিত থাকে; তেমনই বাংলা ব্যাকরণ নাম দিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িয়া থাকি, তাহাতে অল্প পরিমাণ বাংলার গন্ধ থাকে। (ভাষার ইঙ্গিত, রবীন্দ্রনাথ ২০১১ [১৩১১]: ৬৪৩)

তবে প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণ নির্মাণে বৈয়াকরণদের সংস্কৃত নির্ভরতার ব্যাপারটি রবীন্দ্রনাথসহ তৎকালে অধিকাংশ ভাষাতাত্ত্বিকের দ্বারা তিরস্কৃত ও সমালোচিত হলেও রবীন্দ্রনাথ নিজে বাংলার সঙ্গে সংস্কৃত উপাদান তথা শব্দাবলির অন্তর্ভুক্তি ও মিথস্ক্রিয়ার বিষয়টিকে ইতিবাচক দৃষ্টিতেই দেখেছেন। যেহেতু এসব সংস্কৃত উপাদান বাংলা ভাষার ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে এক ধরনের ওজোগুণ ও ঋজুধর্মিতা দান করার পাশাপাশি পরিভাষা সৃষ্টি ও নামায়নে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে, সেহেতু তিনি এসব উপাদানকে বাংলা ভাষার সৌন্দর্যবর্ধনকারী বেশভূষারূপে অভিহিত করেছেন। উন্নত বেশভূষা যেমন মানুষের লজ্জা নিবারণের পাশাপাশি তার আভিজাত্যকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়, সংস্কৃত শব্দাবলির ভূমিকাও বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে ঠিক তাই। ফলে, তাঁর মতে, বাংলার সঙ্গে এর বিচ্ছেদ কিছুতেই কাম্য নয়। কেননা —

> সংস্কৃত ভাষার যোগ ব্যতীত বাংলার ভদ্রতা রক্ষা হয় না এবং বাংলা তাহার অনেক শোভা ও সফলতা হইতে বঞ্চিত হয়, কিন্তু তবু সংস্কৃত বাংলার অঙ্গ নহে, তাহা তাহার আবরণ, তাহার লজ্জা রক্ষা, তাহার দৈন্য গোপন, তাহার বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনসাধনের বাহ্য উপায়। (ভাষার ইঙ্গিত, রবীন্দ্রনাথ ২০১১ [১৩১১] : ৬৪৩)

একটি বিষয় স্মর্তব্য যে, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে শুধু সংস্কৃত উপাদান বা শব্দাবলিই নয়, বরং ইংরেজিসহ অন্যান্য বিভাষী শব্দাবলিও (এমনকি ব্যাকরণিক উপাদানও, যেমন কিছু সংস্কৃত প্রত্যয়, দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের "*বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত*" প্রবন্ধটি) দীর্ঘদিন বাংলা ভাষায় সহাবস্থান ও মিথস্ক্রিয়ার কারণে এদের উচ্চারণ ও আকৃতিতে বাংলার সঙ্গে এক ধরনের সাঙ্গীকরণ হয়েছে। তাই এগুলোকে এখন আর বিদেশী তকমা না দিয়ে বাংলার একান্ত নিজস্ব সম্পদরূপেই গ্রহণ করা উচিত। উপরিউক্ত বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ এমন এক ধরনের বাংলা ব্যাকরণের অন্বেষণে ব্যাপৃত থেকেছেন যেটি শুধু সংস্কৃত প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণ কাঠামো থেকে পৃথকই নয়, বরং বাংলার নিজস্ব ভাষিক উপাদানের ব্যাখ্যার পাশাপাশি বাংলা ভাষায় সাঙ্গীকৃত সংস্কৃতসহ সব বিভাষিক উপাদানের নিজস্ব চারিত্র্য উন্মোচনেও সচেষ্ট হবে। যেহেতু এ ধরনের প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণ এখনও রচিত হয়নি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধসমূহে এ ধরনের ব্যাকরণের রূপকল্প সম্পর্কে কিছু বিক্ষিপ্ত সংকেত প্রদান করেছেন। এসব সংকেত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নিম্নে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা প্রদান করা হলো।

৪. (রবীন্দ্রনাথের) প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণের রূপকল্প

'সাহিত্যওয়ালা' রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার যে কোনো ভাষিক রূপের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শুধু তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টির ওপরই নির্ভরশীল ছিলেন না, বরং আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকের মতো পরম নিষ্ঠা সহযোগে এ সংক্রান্ত বিস্তৃত উপাত্ত সংগ্রহ করে আলোচনাপূর্বক উপাত্তনির্ভর ফলাফলের ওপরই গুরুত্বারোপ করতেন। এক্ষেত্রে তাঁর কাজের ধরনটি ছিল অনেকটা হালের মাঠভিত্তিক গবেষণাকার্যের (empirical study) মতো। তাঁর *শব্দতত্ত্ব* গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধ ও *বাংলাভাষা-পরিচয়* (১৯৬৯) গ্রন্থের বিশ্লেষণধর্মিতার দিকে নজর দিলেই এর সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়। আর এই বস্তুনিষ্ঠা ও প্রয়োগবাদী মননই প্রকারান্তরে তাঁকে প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণের রূপকল্প নির্মাণে প্রেরণা দান করেছে।

৪.১ ভাষা বিশ্লেষণে রবীন্দ্র-বস্তুনিষ্ঠা

এখন প্রশ্ন হলো, মননশীল কবি ও হৃদয়বৃত্তির গভীর রূপকার রবীন্দ্রনাথ কিভাবে একজন একনিষ্ঠ গবেষকের এই বস্তুনিষ্ঠার গুণটি অর্জন করলেন? ভাষা গবেষণায় কেনই বা তিনি শুধু নিজস্ব ভাষা অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর না করে উপাত্ত বিশ্লেষণের ওপর গুরুত্বারোপ করলেন? এর উত্তরে প্রথমেই অনুমান করা যেতে পারে যে কবি ও গদ্যশিল্পী হিসেবে তিনি ছিলেন ভাষার কারবারি ও শব্দ-জহুরি। যে কোনো ভাষাশিল্প — তা সে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ যা-ই হোক — সৃজন করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত তাঁকে শব্দ নিয়ে ঘাটতে

হয়েছে ; শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিটি শব্দের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়েছে। আর এভাবেই তিনি হয়ে ওঠেন বাংলা ভাষার অপ্রতিদ্বন্দ্বী শব্দ-জহুরি। ভাষাবিজ্ঞানী মাত্রই জানেন যে, শব্দ এককভাবে অথবা বাক্যিক উপাদানরূপে একটি ভাষার সমস্ত আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য যথা—ধ্বনিগুণ, রূপগুণ, বাক্যগুণ ও অর্থগুণকে ধারণ করে। ফলে শব্দ-জহুরি হিসেবে প্রকারান্তরে তিনি হয়ে ওঠেন এক নিবিড় ভাষা-বিশ্লেষক। তাছাড়া বাংলা ভাষার অন্তঃসংগঠন উন্মোচন বিষয়ে তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহও তাঁকে ভাষা গবেষক হতে সাহায্য করেছে। এক্ষেত্রে আরও দুটি গবেষণা-মতকে আমরা বিবেচনায় নিতে পারি। ভাষাতাত্ত্বিক সুনীল (১৯৮৯) আমাদের জানাচ্ছেন যে, ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের বস্তুনিষ্ঠ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সর্ব-ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব চর্চার সমৃদ্ধ ঐতিহ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। অর্থাৎ বিখ্যাত ভারতীয় প্রাচীন বৈয়াকরণ, যথা— ভর্তৃহরি, বাচস্পতি মিশ্র (হয়তো পাণিনিও, এ অনুমান প্রবন্ধকারের) প্রমুখের ভাষাতত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রে যে পরিমিতিবোধ ও বস্তুনিষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়, তা-ই রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছে। ভাষাতাত্ত্বিক সুনীল বলেন —

> সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যিনি মানবতাবাদী, সেই রবীন্দ্রনাথ ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় অস্বাভাবিক বস্তুতান্ত্রিক হয়ে উঠেছেন। তাঁর এই পথ বেছে নেওয়ার সুবিধা হয়েছে আমাদের দেশের ভাষাতত্ত্বের ও ভাষাদর্শনের পূর্ববর্তীদের কাজের জন্য। ভর্তৃহরি, বাচস্পতি মিশ্র, একচক্ষু রঘুনাথ শিরোমণিরা এর ভিত্তি তৈরি করে গেছেন। (১৯৮৯: ৩)

বাংলা ভাষা বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ প্রথম উদ্যোগী হয়ে ওঠেন ১৭ বছর বয়সেই, যখন ১৮৭৮ সালে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে পড়াশুনা উপলক্ষে লন্ডন গিয়ে তিনি ডাক্তার স্কটের কন্যাকে বাংলা শেখাতে শুরু করেন। এক্ষেত্রে তিনি খেয়াল করেন যে, বাংলা শব্দের উচ্চারণের ক্ষেত্রে প্রচুর ব্যতিক্রম ও বিশৃঙ্খলা বর্তমান (রবীন্দ্রনাথ ২০১১)। ফলে এই বৈচিত্র্যের অন্তর্ধর্ম অনুধ্যানপূর্বক সেগুলো সূত্রবদ্ধ করে ১৮৮৫ সালে ঠাকুরবাড়ির উদ্যোগে প্রকাশিত 'বালক' পত্রিকায় প্রকাশ করেন তাঁর প্রবন্ধ 'বাংলা উচ্চারণ' (মুসা ১৯৯১; নির্মল ২০০০)। এছাড়া নির্মল দাশ (২০০০) আমাদের জানাচ্ছেন যে, ঠাকুরবাড়ির উদ্যোগে প্রকাশিত বালক-ভারতী-সাধনা পত্রিকায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত স্বল্পস্থায়ী 'সারস্বত সমাজ,এর সভায় এবং পরবর্তীতকালে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের (১৮৯৩/১৮৯৪) সভা ও পত্রিকায় পঠিত ও প্রকাশিত বিভিন্ন আলোচনা ও প্রবন্ধসমূহে রবীন্দ্রনাথকে শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীসহ বিভিন্ন সংস্কৃত পণ্ডিতের সঙ্গে বাংলা ভাষার অতিমাত্রায় সংস্কৃতনির্ভরতার বিষয়ে তর্কযুদ্ধ ও বাহাসে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। আর এই বিতর্কে লড়তে গিয়ে তাঁকে যে ক্ষুরধার যুক্তি ও তথ্যময়তার ওপর নির্ভর করতে হয়েছিল, তা-ই তাঁকে পরিণতিতে ভাষা বিশ্লেষণে বস্তুনিষ্ঠ হতে সহায়তা করেছে।

৪.২ ভাষাতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ

বাংলা ভাষার উপাদান বিশ্লেষণে রবীন্দ্র-মননের বস্তুনিষ্ঠা এবং বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে প্রয়োগবাদিতার আশ্রয় শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে ভাষাতাত্ত্বিকের মর্যাদা এনে দিয়েছে। রবীন্দ্র-পরবর্তী বিভিন্ন বৈয়াকরণ ও ভাষাবিজ্ঞানী কুণ্ঠাহীন চিত্তে তাঁকে এ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন (আবদুল হাই ১৯৯৪; গোপাল হালদার ১৯৮৯; সুনীল ১৯৮৯)। মূলত

বাংলা ভাষার বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে তাঁর যে সচেতন অভীপ্সা, গভীর অনুধ্যান ও সতর্ক অনুসন্ধিৎসা, ভাষা বিশ্লেষণে তাঁর যে বর্ণনাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও নিরাসক্ত মূল্যায়ন পরিণতিতে তা তাঁকে ভাষাতাত্ত্বিক হতে সাহায্য করেছে। এ বিষয়ে আমরা ভাষা বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিটি নিম্নোক্ত রবীন্দ্র-বয়ানে দেখে নিতে পারি।

> যে-কথাগুলা লইয়া আমি আলোচনা করিয়াছিলাম, তাহাদিগকে বাংলায় বা বাংলা হইতে খারিজ করিয়া দেওয়া আমার বা আর-কাহারও সাধ্য নহে। তাহারা আছে, এবং কাহারও কথায় তাহারা নিজের স্থান ছাড়িবে না। জগতে যে-কোনো জিনিসই আছে, তাহা ছোটো হউক আর বড়ো হউক, কুৎসিত হউক আর সুশ্রী হউক, প্রাদেশিক হউক আর নাগরিক হউক, তাহার তত্ত্বনির্ণয় বিজ্ঞানের কাজ। শরীরতত্ত্ব কেবল উত্তমাঙ্গেরই বিচার করে এমন নহে, পদাঙ্গুলিকেও অবজ্ঞা করে না। বিজ্ঞানের ঘৃণা নাই, পক্ষপাত নাই। (বাংলা ব্যাকরণ, রবীন্দ্রনাথ ২০১১[১৩০৮] : ৭৫১)

১৯১৬ সালে সোস্যুরের মৃত্যু-পরবর্তী গ্রন্থ *Course in General Linguistics* প্রকাশের মধ্য দিয়ে বর্ণনামূলক বা সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হয় এবং ভাষাবিজ্ঞান ভাষার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যের বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়ে অনুশাসনের খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসে। এভাবেই শুরু হয় এ শাস্ত্রের প্রকৃত আধুনিকতার যুগ। কেননা প্রথাগত ব্যাকরণে একটি উন্নত ভাষার ব্যাকরণ কাঠমোর ভিত্তিতে ভার্নাকুলার বা প্রাদেশিক ভাষার ব্যাকরণ সৃজন এবং সেই মানদণ্ড অনুসারে প্রাদেশিক ভাষার ব্যাকরণের শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয় বিষয়ক অনুশাসন আর যা-ই হোক, তা কিছুতেই বৈজ্ঞানিক হতে পারে না। কারণ এতে প্রাদেশিক ভাষার বিভিন্ন ভাষিকরূপের অন্তর্নিহিত অবয়বটি ফুটে ওঠে না। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের এই অতিক্রমণের বিষয়টি মাথায় রেখে যদি আমরা উপরিউক্ত উদ্ধৃতিটি লক্ষ করি তাহলে দেখব যে, রবীন্দ্রনাথও এতে সংস্কৃত প্রভাবিত ব্যাকরণবিদদের অনুশাসনের প্রসঙ্গটি বাদ দিয়ে বাংলা ভাষা বিশ্লেষণে বর্ণনাধর্মিতার দিকেই গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি 'বাংলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধে বাংলা ব্যাকরণ বিষয়ে উপরের এই উক্তিটি করেছেন বাংলা ১৩০৮ বা খ্রিষ্টিয় ১৯০১ সালে। অন্যদিকে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের জনক সোস্যুরের গ্রন্থটি, যেটি বর্ণনামূলক বা সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের ইশতেহার হিসাবে বিবেচিত, প্রকাশিত হয় ১৯১৬ বালে। এতে মনে হতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথ সোস্যুরের অনেক আগেই বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের ভিত্তিরূপটি নির্মাণ করে গেছেন। তবে এ বিবেচনাটিও আমাদের মাথায় আনতে হবে যে, সোস্যুর যেমন বিদ্যায়তনিক শিক্ষায় প্রশিক্ষিত ভাষাতাত্ত্বিক ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তেমন ছিলেন না; বা তাবৎ বিশ্বের ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞান ও ঐতিহ্যের বিবর্তনের পূর্বাপরের বিষয়টি মাথায় রেখে সোস্যুরের মতো রবীন্দ্রনাথ বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের দুনিয়া কাঁপানো কোনো তত্ত্ব নির্মাণ করে যাননি। ভাষা বিশ্লেষণে সোস্যুরের বর্ণনাধর্মিতা ও সমকালীন উপাত্তের প্রতি গুরুত্বের পাশাপাশি এর বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের যে পক্ষপাত তা মূলত প্রবন্ধকার হিসেবে তাঁর যে বৈজ্ঞানিক অভীপ্সা ও অনুসন্ধিৎসা, যা তাঁর ভাষা ব্যতীত অন্যান্য বিষয় যথা বিজ্ঞান, সমাজধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে রচিত প্রবন্ধসমূহেও লক্ষণীয়, তারই প্রতিফলন। সর্বোপরি, ভাষা বিশ্লেষণে এই বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁকে প্রকারান্তরে আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকের মর্যাদা এনে দিয়েছে।

ভাষাতাত্ত্বিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের বাংলা ভাষার বিভিন্ন ভাষিক উপাদানের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা ও এদের অন্তর্নিহিত সাধারণ বৈশিষ্ট্য উন্মোচনের বিবরণ তাঁর *শব্দতত্ত্ব* গ্রন্থের নানা প্রবন্ধে বর্তমান। এ প্রসঙ্গে আমরা 'বাংলা উচ্চারণ', 'স্বরবর্ণ অ', 'স্বরবর্ণ এ', 'বাংলা ক্রিয়াপদের তালিকা' ইত্যাদি প্রবন্ধ সহজেই উল্লেখ করতে পারি। বিশেষ করে প্রথম তিনটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় এই প্রথম 'অ' এবং 'এ' ধ্বনির বিভিন্ন প্রতিবেশকাতর উচ্চারণ সূত্রবদ্ধ করেন, যদিও তিনি তাঁর প্রবন্ধে 'ধ্বনি'র পরিবর্তে 'বর্ণ' কথাটিই ব্যবহার করেন। অর্থাৎ বিভিন্ন প্রতিবেশের কারণে বা পাশ্ববর্তী লাগোয়া ধ্বনির প্রভাবে কিভাবে 'অ' ধ্বনির উচাচারণ 'ও' হয়ে যায়, বা 'অ' অক্ষুণ্ন থাকে, এবং কি প্রক্রিয়ায় 'এ' ধ্বনির উচাচারণ 'এ্যা' হয়ে যায বা 'এ' অক্ষুণ্ন থাকে তা সূত্রবদ্ধ করেন। কিন্তু ঠিক কোন অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় এই ভাষাতাত্ত্বিক পরিবর্তন সাধিত হয়, তা শনাক্ত করতে পারেননি। এই উচ্চারণসূত্র নির্মাণের পদ্ধতি হিসেবে তিনি অভিধান থেকে শব্দ সংগ্রহ-পরবর্তী স্বীয় উচ্চারণ প্রক্রিয়াকেই অবলম্বন করেছেন বলে জানিয়েছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি অভিধান থেকে শব্দ সংগ্রহের পরিবর্তে যদি প্রমিত বাংলা ব্যবহারকারী বাঙালির উচ্চারণকে আশ্রয় গ্রহণ করতেন, অথবা তাঁর উচ্চারণকে আরও কয়েকজনের দ্বারা যাচাই-বাছাই করিয়ে নিতেন তাহলে তা আরও বিজ্ঞানসম্মত হতো। আবার এসব উচ্চারণসূত্র সৃজনের ক্ষেত্রে তিনি কোলকাতার উচ্চারণকে 'আদর্শ' হিসেবে ধরেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। এখানে কোলকাতার উচ্চারণ বলতে আসলে কী বোঝায়? কোলকাতা তখনকার দিনেই বাংলার বিভিন্ন এলাকার মানুষের সম্মিলনে এক বিশাল নগরীতে পরিণত হয়। তিনি নিজেই বলেছেন, 'কলিকাতা সমস্ত বঙ্গভূমির সংক্ষিপ্তসার'। তাহলে কোলকাতার বিশেষ কোন অঞ্চলের বা কোন গোষ্ঠীর উচ্চারণকে রবীন্দ্রনাথ 'আদর্শ' হিসেবে ধরেছেন? রবীন্দ্রনাথের এই উচ্চারণসূত্র বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর উপরিউক্ত সীমাবদ্ধতাগুলোকে সময়ের মানদণ্ডে বিচার করা যায়। কেননা, সময়ের দাবি হয়তো সে রকম ছিল না। আবদুল হাই (১৯৯৪) এক্ষেত্রে অনুরূপ ধারণা পোষণের পাশাপাশি এ-ও বলেছেন যে, তা করার মতো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা রবীন্দ্রনাথ লাভ করেননি। কেননা, ভাষার ধ্বনি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শাস্ত্র হিসেবে ভাষাবিজ্ঞান তখন সে রকম মানে পৌঁছায়নি যা থেকে রবীন্দ্রনাথ কোনো সংকেত বা সূত্র পেতে পারতেন। ভাষাবিজ্ঞান মূলত তখন ইউরোপ আমেরিকাতে হাঁটি হাঁটি পা পা করে বৈজ্ঞানিক রীতিনীতিকে অঙ্গীভূত করে নেওয়ার দীক্ষা গ্রহণ করছে মাত্র। ফলে ভারতবর্ষে নিস্তরঙ্গ বিদ্যায়তনিক পরিমণ্ডলে এটি তখনও কোনো সচল তরঙ্গ বা দোলা সৃষ্টি করতে পারেনি।

সর্বোপরি, বাংলা ভাষা বিশ্লেষণে ভাষাতাত্ত্বিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব হলো, তিনি তাঁর নিরাসক্ত ও বস্তুনিষ্ঠ মননে এই ভাষার বিভিন্ন ভাষিক উপাদানের যে বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন, তা তাঁর সমকালের ভাষাচর্চায় অভিনব ও অতি আধুনিক। পাশাপাশি, তিনি তাঁর ভাষাবিষয়ক আলোচনায় প্রবল যুক্তি ও বিশ্লেষণসহকারে বাংলা ভাষাকে শুধু যে সংস্কৃত ব্যাকরণ কাঠামোর গহ্বর থেকে তুলে আনতে চেয়েছেন তা-ই নয়, চিহ্নিতও করতে চেয়েছেন বাংলা ব্যাকরণের এক নিজস্ব কাঠামোকে।

৪.৩ বাংলা ব্যাকরণের প্রাণ-কাঠামো

প্রত্যেক ভাষা — জনসংখ্যার বিচারে সে যত উনই হোক, সাহিত্যিক মানে সে যত অপরিপক্কই হোক, অথবা তার লিখিত রূপ না-ই বিকশিত হোক — একটা নির্দিষ্ট ছাঁচ বা কাঠামো মেনে চলে। এই নিজস্ব কাঠামোর অন্তর্নিহিত শক্তিতে সে ভাষা যে কোনো বহিস্থ উপাদানকে কালের ধারাবাহিকতায় নিজের নিয়মের অধীন করে নিতে পারে। প্রতিটি ভাষা এই কাঠামোগত শক্তিকে ধারণ করে বলেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সহযোগে সে বেঁচে থাকে। প্রতিটি ভাষার এই অভ্যন্তরীণ কাঠামোটি অন্য আরেকটি ভাষা — জনসংখ্যার বিচারে সে যত বড়ই হোক, সাহিত্যিক মানে সে যত সমৃদ্ধই হোক, অথবা তার লিখিত রূপ যতই উন্নত হোক — থেকে পৃথক। আর দুটি ভাষার এই পার্থক্যের কারণে অভিন্ন ছাঁচ দিয়ে তাদের বিশ্লেষণ করা অন্যায্য। এই সত্যটি সংস্কৃত ও বাংলার ক্ষেত্রেও সমান তাৎপর্যে প্রযোজ্য।

বাংলা ভাষার সবচেয়ে নিষ্ঠাবান কারিগর এবং শক্তিশালী ভাষাশিল্পী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সারা জীবন এই ভাষায় সাহিত্য রচনার সুবাদে এর নাড়ীর সংবাদ ও প্রাণের খবরটির নাগাল পেয়েছিলেন বলে উপরিউক্ত মীমাংসায় স্থিত হয়েছেন । পাশাপাশি, তিনি লক্ষ করেছেন যে, এর বিভিন্ন ভাষিক উপাদান, যথা— ধ্বনি, শব্দ, বাক্য এমনকি অর্থ একটি নির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে চলে, যা সংস্কৃত থেকে একেবারেই আলাদা। ফলে যতই সংস্কৃত ব্যাকরণের নিগড়ে এ ভাষাকে বাঁধা হোক না কেন, এর অনেক নিজস্ব ও দেশজ উপাদান অব্যাখ্যাত থেকেই যায় যার অকাট্য প্রমাণ তিনি 'বাংলা ব্যাকরণ' ও 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' প্রবন্ধে বাক্যের সংগঠন ও প্রত্যয় পরিচিতি আলোচনায় দেখিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, একটি শক্তিশালী ছাঁচ-কাঠামো ধারণ করে বলেই বাংলা ভাষা শুধু দেশজ ভাষিক উপাদান নয়, বরং সংস্কৃতসহ অসংখ্য বিদেশী রূপ ও শব্দ উপাদানকে নিজস্ব ছাঁচে ঢালাই করে নিজের নিয়মের অধীন করে নিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দগুলো লিখিতরূপে অবিকৃত থাকলেও বাঙালি তার নিজস্ব ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে, যা সংস্কৃত থেকে পৃথক, উচ্চারণ করে। এভাবে পোর্তুগিজ, ফরাসি, ইংরেজি থেকে আগত অসংখ্য শব্দ বাংলার ধ্বনি বৈশিষ্ট্যের ছাঁচে গড়ে এ ভাষার নিজস্ব ভাষিক সম্পদে পরিণত হয়েছে। ফলে রবীন্দ্রনাথের মতে, বাংলা ব্যাকরণের কাজ হচ্ছে বাংলা ভাষার এ সব নিয়ম বিশ্লেষণকারী আভ্যন্তর ছাঁচটি খুঁজে বের করা। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন —

> বস্তুত প্রত্যেক ভাষার নিজের একটা ছাঁচ আছে। উপকরণ যেখান হইতেই সে সংগ্রহ করুক, নিজের ছাঁচে সে তাহাকে আপনার সুবিধামত বানাইয়া লয়।...ভাষার সেই প্রকৃতিগত ছাঁচটা বাহির করাই ব্যাকরণকারের কাজ। বাংলায় সংস্কৃতশব্দ ক'টা আছে তাহার তালিকা করিয়া বাংলা চেনা যায় না, কিন্তু কোন বিশেষ ছাঁচে পড়িয়া সে বিশেষরূপে বাংলা হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সংস্কৃত ও অন্য ভাষার আমদানিকে কী ছাঁচে ঢালিয়া আপনার করিয়া লয়, তাহাই নির্ণয় করিবার জন্য বাংলা ব্যাকরণ। (বাংলা ব্যাকরণ, রবীন্দ্রনাথ ২০১১[১৩০৮] : ৭৫৩-৭৫৪)

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলা ব্যাকরণবিদ বা ভাষাতাত্ত্বিকের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে এ ভাষার সেই কাঠামোটি শনাক্ত করা যার কল্যাণে সে দেশজ, বিদেশী ভাষিক উপাদানকে আপন

করে নিতে পারে। এখন আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, রবীন্দ্রনাথ ভাষার ছাঁচ বলতে আসলে কী বুঝিয়েছেন? এর ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাটিই বা কী হতে পারে? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, বাংলা ভাষার ছাঁচ বা কাঠামোটি আসলে এই ভাষার অন্তর্নিহিত সাংগঠনিক নিয়ম পরম্পরা যার দ্বারা এর বিভিন্ন ভাষিক উপাদানের আত্মস্থকরণ প্রক্রিয়াটিকে ব্যাখ্যা করা যায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলা ভাষায় এ ধরনের কোনো ব্যাকরণ কি লিখিত হয়েছে যাতে এ ধরনের ভাষিক নিয়মের বিস্তৃত বিবরণসহ ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে? এর উত্তর স্বভাবতই 'না'। রবীন্দ্রনাথের ভাষাবিষয়ক বিভিন্ন আলোচনায় বাংলা উচ্চারণসহ কিছু উপাদানের বিক্ষিপ্ত সূত্র ও নিয়ম বর্ণনার বিষয়টি প্রতিফলিত হলেও তা কিছুতেই সম্পূর্ণ নয়। তাই তিনি নিজেই এ ধরনের কাঠামোভিত্তিক বাংলা ব্যাকরণ রচনার ভার ভবিষ্যৎ ভাষাবিজ্ঞানীদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন এই বলে যে —

> ...প্রাকৃত বাংলাভাষার নিজের একটি স্বতন্ত্র আকারপ্রকার আছে এবং এই আকৃতিপ্রকৃতির তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া শ্রদ্ধার সহিত অধ্যবসায়ের সহিত বাংলাভাষার ব্যাকরণরচনায় যদি যোগ্য লোকের উৎসাহ বোধ হয়, তাহা হইলে আমার এই বিস্মরণযোগ্য ক্ষণস্থায়ী চেষ্টা সার্থক হইবে। (ভাষার ইঙ্গিত, রবীন্দ্রনাথ ২০১১[১৩১১] : ৬৫১)

৪.৪ সামষ্টিক ভাষাবোধের ব্যাকরণ

বাংলা ভাষার আভ্যন্তর কাঠামো নির্দেশক যে বাংলা ব্যাকরণ নির্মাণের দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ দেশের ভবিষ্যৎ ভাষাবিজ্ঞানীদের হাতে অর্পণ করে গেছেন তার রূপকল্পের কোনো নির্দেশনা কি তিনি নিজেই রেখে গেছেন? বিশেষ করে, এ ব্যাকরণ লেখার পদ্ধতিটি কী হবে এ বিষয়ে তাঁর কি কোন লিখিত বক্তব্য আছে? প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষা ও ব্যাকরণ বিষয়ক কোনো প্রবন্ধেই এ সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ ধারণা বা বক্তব্য আমাদের প্রদান করে যাননি। তবে এসব রচনায় তিনি বাংলা ব্যাকরণ নির্মাণের আওতা ও উপকরণ বিষয়ে এমন কিছু প্রণিধানযোগ্য উক্তি করেছেন যেগুলো থেকে প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণের প্রকৃতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু সংকেত উদ্ধার করা সম্ভব। এরকম দুটি প্রণিধানযোগ্য উদ্ধৃতি হলো —

১. বাংলাদেশে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষাগুলির একটি তুলনামূলক ব্যাকরণ যদি লিখিত হয়, তবে বাংলাভাষা বাঙালির কাছে ভালো করিয়া পরিচিত হইতে পারে।...কিন্তু তাহার পূর্বে উপকরণ সংগ্রহ করা চাই। নানা দিক হইতে সাহায্য পাইলে তবেই ক্রমে ভাবী ব্যাকরণকারের পথ সুগম হইয়া উঠিবে। (ভাষার ইঙ্গিত, রবীন্দ্রনাথ ২০১১ [১৩১১]: ৬৪৪)

২. বাংলা ভাষায় একখানি ব্যাকরণ-রচনা সাহিত্য-পরিষদের একটি প্রধান কাজ। কিন্তু কাজটি সহজ নহে। এই ব্যাকরণের উপকরণ সংগ্রহ একটি দুরূহ ব্যাপার। বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যতগুলি উপভাষা প্রচলিত আছে তাহারই তুলনাগত ব্যাকরণই যথার্থ বাংলার বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ। আমাদের ছাত্রগণ সমবেতভাবে কাজ করিতে থাকিলে এই বিচিত্র উপভাষার উপকরণ সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না। (ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ, রবীন্দ্রনাথ ২০০৪ [১৩১২] : ৭০৬)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতি দুটিতে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার প্রকৃত ব্যাকরণ নির্মাণের ক্ষেত্রে উপভাষাগুলির উপর জোর দিয়েছেন। অর্থাৎ এ ভাষার প্রধান প্রধান উপভাষার তুলনামূলক

ব্যাকরণ রচনা করা সম্ভব হলে এর ভেতর থেকেই প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণের সূত্রসমূহ বেরিয়ে আসবে। প্রথম উদ্ধৃতিটিতে রবীন্দ্রনাথ 'উপভাষার' পরিবর্তে 'প্রাকৃত' শব্দটি ব্যবহার করলেও সাধারণ বিবেচনাবোধ থেকে উপলব্ধি করা সম্ভব যে এই 'প্রাকৃত' শব্দটি আসলে 'উপভাষার'ই নামান্তর। পাশাপাশি, রবীন্দ্রনাথ এই প্রথম 'বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন (দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে)। ধারণা করা যেতে পারে যে, এই 'বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ' বলতে তিনি আসলে সেই ব্যাকরণকেই বুঝিয়েছেন যার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার প্রধান প্রধান উপভাষার ভাষিক রূপের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনার পাশাপাশি এর প্রধান ছাঁচটি উন্মোচিত হবে।

এখন আসা যাক বাংলা ভাষার উপভাষাগুলির উপাত্ত সহযোগে ব্যাকরণ রচনা সম্ভব কি-না। ভাষাতাত্ত্বিক মনসুর মুসা (১৯৯১) তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণের ধারণা' প্রবন্ধে উপরিউক্ত দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি ব্যবচ্ছেদপূর্বক নিজস্ব যুক্তি সহযোগে এই বিষয়ে কিছু নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেছেন সেগুলি নিম্নে উল্লেখ করা যেতে পারে।

১. বৈজ্ঞানিক অর্থে বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ কোনো ভাষায় রচিত হতে পারে কি?
২. বাংলা অঞ্চলে ১৯৪৭ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কারণে বাংলা ভাষার প্রচলিত উপভাষা বিভাজন সংশয়মুক্ত নয়।
৩. রবীন্দ্রনাথের বাংলা ব্যাকরণে বাংলা ভাষার সামাজিক উপভাষার অবস্থান কী হবে?

জনাব মুসা উত্থাপিত এসব প্রশ্ন ও মন্তব্য প্রয়োজনীয় প্রতিযুক্তির মাধ্যমে সহজেই খণ্ডন করা যায়। প্রথমে রবীন্দ্রনাথের ব্যাকরণের বৈজ্ঞানিকতা বিষয়ে আর কোনো অতিরিক্ত প্রতি-মন্তব্য বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও ব্যাকরণ বিষয়ক প্রবন্ধগুলো পাঠ করলে দেখা যাবে যে, তাঁর ব্যাকরণের বৈজ্ঞানিকতা বিষয় বা ধারণা এই প্রবন্ধের পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের মতোই যথাযথ। মনসুর মুসার বৈজ্ঞানিকতার ধারণার সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। আর রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর ব্যাকরণচিন্তায় এরকম কোনো ধারণাও পোষণ করেননি। দ্বিতীয়ত, বাংলা ভাষার উপভাষার শনাক্তকরণ ও এর রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে মুসা সংশয়মুক্ত নন। কেননা তাঁর মতে, (১) গ্রিয়ারসনকৃত বাংলা ভাষার উপভাষা বিভাজন ত্রুটিপূর্ণ এবং (২) ১৯৪৭ সালের রাজনৈতিক বিভাজনজনিত মাইগ্রেশনের কারণে বাংলা ভাষার ঔপভাষিক অঞ্চলগুলিতে জনপ্রবাহ পরিস্থিতি অনেকটা মিশ্রিত হয়ে গেছে। ফলে উপভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি স্থির না থেকে এক ধরনের প্রবহমানতা তৈরি হয়েছে। তাই আগের মতো বিশুদ্ধ ঔপভাষিক বৈশিষ্ট্য আর অক্ষুণ্ন নেই। এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হলো গ্রিয়ারসনকৃত উপভাষা বিভাজন শুধু বাংলা অঞ্চলে নয়, ভারতের অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রেও এখন পর্যন্ত আদর্শ হিসেবে স্বীকৃত। তাছাড়া এর চেয়ে ভালো কোনো উপভাষা বিভাজন পদ্ধতি এখনও যেহেতু স্থিরীকৃত হয়নি, তাই এই বিভাজন দিয়ে এখনও কাজ চালানো যেতে পারে। অন্যদিকে, এই পৃথিবীতে জনপ্রবাহের স্থানান্তর যেহেতু একটি নৈমিত্তিক ঘটনা, এক্ষেত্রে ঔপভাষিক বৈশিষ্ট্যের স্থিরতা রক্ষা করা কঠিন বিষয়। সারা পৃথিবীর সব ভাষার উপভাষাতেই মাইগ্রেশনের কারণে প্রতিনিয়ত এ ধরনের কিছু না কিছু পরিবর্তন ঘটছেই। আর এই পরিবর্তন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শব্দরূপের পরিবর্তন, বাক্যিক সংগঠনের নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কোনো ভাষার উপভাষা বিভাজন মূলত রাজনৈতিক

হলেও, তা অনেকটা ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিকও বটে। ফলে ১৯৪৭ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তন বাংলা ভাষার উপভাষার সাংগঠনিক পরিবর্তনে খুব বেশি ভূমিকা রেখেছে বলে মনে হয় না। সবশেষে, বাংলা ব্যাকরণ নির্মাণের জন্যে স্থানিক উপভাষার পাশাপাশি মুসা (১৯৯১) উত্থাপিত বাংলার সামাজিক উপভাষাটি এখানে খুব প্রাসঙ্গিক নয়। কেননা, কোনো একটি ভাষার উপভাষাসমূহের আবশ্যিক ব্যাকরণিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে এই সামাজিক উপভাষাকে এখনও খুব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয় না। বরং একটি ভাষার মূল ব্যাকরণের প্রান্তিক বিষয় হিসেবে এটি ভাষাবিজ্ঞানে আলোচিত হয়ে থাকে।

উপরের দুটি উদ্ধৃতিতেই রবীন্দ্রনাথ উপভাষার ব্যাকরণ নির্মাণে উপকরণ বা উপাত্ত সংগ্রহকে দুরূহ কাজ বলে মনে করেন। তাই তিনি এ কাজে ছাত্রদের একান্ত সহযোগিতা কামনা করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর সম্মিলিত সহযোগিতার কথা থেকে বোঝা যায় যে, ভাষারূপের উপাত্ত সংগ্রহে তিনি যথার্থ অর্থেই প্রয়োগবাদী, অর্থাৎ সরেজমিন পদ্ধতিতে মাঠ পর্যায় থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করতে আগ্রহী (দোরনেই ২০০৭)। কারণ এক্ষেত্রে তিনি প্রতিটি বাঙালির ভাষাবোধকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছেন। এভাবে ছাত্ররা মাঠে মাঠে ঘুরে অগণিত বাঙালির ভাষাবোধ উদ্ভূত উপাত্ত সংগ্রহ করার পর তা বিশ্লেষণ করে যে ব্যাকরণ নির্মাণ করা হবে তা হবে বাঙালির প্রাণের ব্যাকরণ, তাঁদের সামষ্টিক ভাষাবোধের ব্যাকরণ। ফলে আশা করা যায় যে এই সামষ্টিক ভাষাবোধের বাংলা ব্যাকরণেই উন্মোচিত হবে বাংলা ভাষার প্রকৃত ছাঁচ বা আভ্যন্তর-কাঠামোটি। এটিই ভাষার কারিগর রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক কামনা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র জীবনে বাংলা ভাষার প্রায় সব উপভাষার মানুষের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার দ্বারা প্রত্যক্ষ করেছেন যে প্রতিটি মানুষের ভাষাবোধ ও জীবন-অভিজ্ঞতাজাত ভাষার প্রকাশভঙ্গিটি ভিন্ন। তাই বাংলা ভাষার অন্তর-কাঠামোর বাস্তবচিত্রটি লাভের জন্য প্রত্যেকটি বাঙালির ভাষা উপাত্ত বিশ্লেষণ জরুরি বলে তিনি ভেবেছেন। মাঠ পর্যায় থেকে ভাষারূপের উপাত্ত সংগ্রহ সংক্রান্ত তাঁর এই ভাবনা একশত বছরের আগে হলেও তা ভাষাবিজ্ঞানের সর্বাধুনিক শাখা সমাজভাষাবিজ্ঞান, মনো-ভাষাবিজ্ঞান, প্রজ্ঞানমূলক (cognitive) ভাষাবিজ্ঞানের উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতির অনেকটা অনুরূপ।

রবীন্দ্রনাথ ব্যাকরণের উপাত্ত সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পদ্ধতিকে অপরিহার্য বিবেচনা করলেও গত একশত বছরের বেশি সময় ধরে বাঙালি ভাষাবিজ্ঞানীরা এক্ষেত্রে কি পদ্ধতি অনুসরণ করছেন তা একটু পর্যালোচনা করা দরকার। প্রকৃতপক্ষে শুধু বাঙালি ভাষাতাত্ত্বিকরাই নন, সারা বিশ্বের তাবৎ তাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞানীরাই যে কোনো ভাষারূপ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে ঘুরে ঘুরে তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহ না করে বরং তাঁদের নিজস্ব সজ্ঞা (intuition) ও ভাষিক অন্তর্দর্শনের (introspection) ওপর নির্ভর করেন। এক্ষেত্রে 'সজ্ঞা' ও 'অন্তর্দর্শন' অভিধাদুটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান এখানে জরুরি। সজ্ঞা হচ্ছে যে কোনো বস্তু বা ভাব সম্পর্কে কোনো ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা যা বহুলাংশেই তার নিজস্ব অভিজ্ঞতাজাত। এ বিষয়ে শ্যামল চক্রবর্তী বলেন —

> সজ্ঞা বলতে স্বতঃস্ফূর্ত অনুধাবন। বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই কোনও মানুষ হঠাৎ করে কোনও অনুধাবনে (perception) পৌঁছে গেলে স্বতঃস্ফূর্ত এরকম 'মনে হওয়া'কে বলে সজ্ঞা বা ইনটুইশন। এও এক মানসিক দক্ষতা, যা অনেক সময় অভিজ্ঞতানির্ভর। (২০১০ : ১০৭)

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, সজ্ঞাবাদীরা ভাষা ও ভাষিক উপাদান বিশ্লেষণ ও এ সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে আসার ক্ষেত্রে তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত উপলব্ধি ও বিবেচনাবোধ এবং নিজস্ব অভিজ্ঞতাকেই গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। অন্যদিকে তালমির (২০০৭) মতে, ভাষিক অন্তর্দর্শন হচ্ছে ভাষার কোনো সুনির্দিষ্ট উপাদান সম্পর্কে ভাষা ব্যবহারকারীর সচেতন মনোযোগ যা তাঁর প্রজ্ঞানসত্তার প্রকাশও বটে। ফলে ঐ ভাষা ব্যবহারকারী যখন সরেজমিন পদ্ধতি অবলম্বন না করে শুধু তাঁর ভাষিক অন্তর্দর্শন দ্বারা পরিচালিত হয়ে কোনো ভাষা বিশ্লেষণ করেন তখন একান্ত অর্থেই তিনি তাঁর প্রজ্ঞানসমৃদ্ধ নিজস্ব ভাষাবোধের দ্বারাই তাড়িত হন।

সজ্ঞা ও অন্তর্দর্শন সম্পর্কিত উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এ প্রতীতি জন্মাতে সাহায্য করছে যে, ভাষা বিশ্লেষণে ভাষিক অন্তর্দর্শনবাদী ও সজ্ঞাবাদীরা একান্তভাবেই মন্ময়বাদী (subjective), নিজস্ব অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে তাঁরা ভাষিক উপাদান ব্যাখ্যা করে থাকেন। তাঁরা মনে করেন, যেহেতু অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতো একই ভাষিক পরিবেশে তাঁরা বেড়ে ওঠেন, তাই একটি ভাষার সব ভাষীদের ভাষাবোধ অভিন্ন হবে। ফলে শুধু ভাষাবিজ্ঞানীর সজ্ঞা ও অন্তর্দর্শন নির্ভর ভাষা বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সকলের ভাষাবোধের প্রতিফলন ঘটবে। কিন্তু প্রজ্ঞানমূলক ভাষাবিজ্ঞানী গিব্‌সের (২০০৭) মতে, বাস্তবে তা ঘটে না। কেননা সব ভাষাভাষী অভিন্ন পরিমণ্ডলে বসবাস করলেও জগৎ ও জীবন সম্পর্কে প্রতিনিয়ত তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যক্ষণের সম্মুখীন হয়। ফলে প্রতিনিয়তই চারপাশের জগৎ সম্পর্কে তাদের ভিন্ন ভিন্ন ধারণাও তৈরি হয় যা তাদের ভাষায় প্রকাশ ঘটে। তাই দেখা যায় যে, একই ভাষিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বসবাস করেও প্রত্যেকের জীবনাভিজ্ঞতা ভিন্ন, এবং একইভাবে তাদের ভাষাবোধের প্রকাশও ভিন্ন থাকে। এ সমস্ত কারণে বলা অসংগত নয় যে, শুধু ভাষাবিজ্ঞানীর সজ্ঞানির্ভর ভাষা বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে একটি ভাষিকগোষ্ঠীর সামগ্রিক ভাষাবোধের প্রতিফলন ঘটে না। রবীন্দ্রনাথ এই অনিবার্য সত্যটি অনেক আগেই উপলব্ধি করেছিলেন বলে প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণ নির্মাণের জন্য উপকরণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমস্ত বাঙালির ভাষাবোধের ওপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন। আমরাও এটা বিশ্বাস করি যে যত দিন না মাঠ পর্যায়ে ঘুরে ঘুরে বাংলার বিভিন্ন উপভাষীর ভাষাবোধের উপাত্ত সংগ্রহপূর্বক বিশ্লেষণ করা হবে, ততদিন প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণ রচিত হবে না।

৫. উপসংহার

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সময়ের তুলনায় অনেকখানি এগিয়ে ছিলেন। তাঁর নিজস্ব জীবনাচরণ, তাঁর রচিত কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প ও প্রবন্ধে রূপায়িত ভাবনা, বক্তব্য ও দর্শনে যেমন এর দেখা মেলে, তেমনি তাঁর ভাষা ও ব্যাকরণবিষয়ক রচনাসমূহেও তা প্রতিফলিত হয়। আর তাঁর এই প্রাগ্রসর চিন্তার কারণেই বাংলা ভাষার প্রকৃত সত্তা সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য বার বার আমাদের ভাষাতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথের কাছে ফিরে যেতেই হয়।

গ্রন্থপঞ্জি

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়. ১৮৯৫-৯৬. বাঙ্গালা ভাষা. *বঙ্গবাসী* ।

গোপাল হালদার. ১৯৮৯. ভূমিকা. *রবীন্দ্রনাথের ভাষাচিন্তা ও আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান* [সুনীল সেনগুপ্ত]. কলিকাতা : নয়া প্রকাশ. পৃ. IX-XI.

নির্মল দাশ. ২০০০. *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ*. কলিকাতা : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

পবিত্র সরকার. ১৯৯০. শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্ব ও ভাষাচিন্তা. *আকাদেমি পত্রিকা*, তৃতীয় সংখ্যা পৃ. ১০-৪৩।

মনসুর মুসা.১৯৯১. *ভাষাচিন্তা : প্রসঙ্গ ও পরিধি*. ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

মুহম্মদ আবদুল হাই. ১৯৯৪. ভাষাতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ. *মুহম্মদ আবদুল হাই বচনাবলী ১* [সম্পা. হুমায়ুন আজাদ]. ঢাকা : বাংলা একাডেমী. পৃ. ৪৩৪-৪৫৪।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর. ১৯৬৯ [১৯৩৮]. *বাংলাভাষা-পরিচয়*. কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

--- --- .২০০৪. আত্মশক্তি. *রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড*. ঢাকা : ঐতিহ্য. পৃ. ৬৫৭-৭৪০।

--- --- .২০১১. শব্দতত্ত্ব. *রবীন্দ্র-রচনাবলী খণ্ড ৬*. ঢাকা : পাঠক সমাবেশ. পৃ. ৬০৩-৬৫১ ও ৭২৮-৭৬৭।

শ্যামল চক্রবর্তী (ডা.). ২০১০. *মেধা মনন বোধ বুদ্ধি*. কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

সুনীল সেনগুপ্ত. ১৯৮৯. *রবীন্দ্রনাথের ভাষাচিন্তা ও আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান*. কলিকাতা : নয়া প্রকাশ।

হুমায়ুন আজাদ. ১৯৯৮. *তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান*. ঢাকা : আগামী প্রকাশনী।

DÖrnyei, Zoltán. 2007. *Research Methods in Applied Linguistics*. Oxford : Oxford University Press.

Gibbs, Raymond. 2006. Why cognitive linguistics should care more about empirical methods. In Gonzalez-Marquez, M., Mittelberg, I., Coulson, S. & Spivey, M. (eds.) *Methods in Cognitive Linguistics*. Amsterdam & Philadelphia: Jogh Benjamins Publishing Company. P. 2-18.

Saussure, F. de.1960. *Courre in General Liuguistics* [trans. Charles Bally & Albert Sechehaye]. London. Peter Owen Limited.

Symacharan, Ganguli. 1990 [1877]. Bengali, Spoken and Written. আকাদেমি পত্রিকা, তৃতীয় সংখ্যা, পৃ. ১৫-৪৩ (পুনর্মুদ্রিত)।

Talmy, Leonard. 2007. Forward. In Gonzalez-Marquez, M., Mittelberg, I., Coulson, S. & Spivey, M. (eds.) *Methods in Cognitive Linguistics*. Amsterdam & Philadelphia: Jogh Benjamins Publishing Company. P. XI-XXI.